

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১১

সূরা মূলক (১-১৪ আয়াত)

সূরা মূলক কুরআনের ৬৭ তম সূরা। মূলক শব্দের অর্থ হল সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty)। সূরাটির আয়াত সংখ্যা ৩০ টি। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয় তাই এটি মাক্কী সূরার শ্রেণীভুক্ত।

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের আল মূলক শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কোন সময় নাযিল হয়েছিলো তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু ও বর্ণনভঙ্গী থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু

এ সূরাটিতে একদিকে ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব লোক বেপরোয়া ও অমনোযোগী ছিল তাদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে। মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে ইসলামের গোটা শিক্ষা ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী করে পাঠানোর উদ্দেশ্য সবিস্তারে নয় বরং সংক্ষেপভাবে বর্ণন করা হয়েছে। ফলে তা ক্রমান্বয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় বদ্ধমূল হয়েছে। সেই সাথে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব ও অমনোযোগিতা দূর করা, তাকে ভেবে চিন্তে দেখতে বাধ্য করা এবং তার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি আয়াতে মানুষের এ অনুভূতিকে জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে বিশ্বলোকে সে বাস করছে তা এক চমৎকার সুশৃংখ ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। হাজারো তালাশ করেও সেখানে কোন রকম দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, কিংবা বিশৃংখলার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এক সময় এ সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মহান আল্লাহই একে অস্তিত্ব দান করেছেন, এর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও শাসনকার্যের সমস্ত ইখতিয়ার নিরংকুশভাবে তারই হাতে। তিনি অসীম কুদরতের অধিকারী। এর সাথে মানুষের একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরম জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থাসঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যে তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তার শুধু সংকর্ম দ্বারাই সে এ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম।

আখেরাতে কুফরীর যে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেবে ৬ থেকে ১১ নং আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের পাঠিয়ে এ দুনিয়াতেই সে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সামাধান করে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি এ পৃথিবীতে নবীদের কথা মনে নিয়ে নিজেদের আচরণ ও চাল-

চলন সংশোধন না করো তাহলে আখেরাতে তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তোমাদের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তোমরা তার উপযোগী।

১২থেকে ১৪ নং আয়াতে এ পরম সত্যটি বুঝানো হয়েছে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি কাজ ও কথা এমনকি তোমাদের মনের কল্পনাসমূহ পর্যন্ত অবগত। তাই নৈতিকতার সঠিক ভিত্তি হলো, মন্দ কাজের জন্য দুনিয়াতে পাকড়াও করার মত কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং ঐ কাজ দ্বারা দুনিয়াতে কোন ক্ষতি হোক বা না হোক, মানুষ সবসময় অদৃশ্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়ে সব রকম মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। যারা এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে আখেরাতে তারাই বিরাট পুরস্কার ও ক্ষমালাভের যোগ্য বলে গণ্য হবে।

১৫ থেকে ২৩ নং আয়াতে পরপর কিছু অবহেলিত সত্যের প্রতি ইংগিত দিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এগুলোকে মানুষ দুনিয়ায় নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার মনে করে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে না। বলা হয়েছে, এ মাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখো। এর ওপর তোমরা নিশ্চিন্তে আরামে চলাফেরা করছো এবং তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় রিযিক সংগ্রহ করছো। আল্লাহ তা'আলাই এ যমীনকে তোমাদের আনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে যে কোন সময় এ যমীনের ওপর ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে তা তোমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। কিংবা এমন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের সবকিছু লুণ্ঠন করে দেবে। মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো। আল্লাহই তো এগুলোকে শূন্য ধরে রাখেন। নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখো। আল্লাহ যদি তোমাদের শাস্তি দিতে চান তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহ যদি তোমাদের রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কে আছে, যে তা খুলে দিতে পারে? তোমাদেরকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়ার জন্য এগুলো সবই প্রস্তুত আছে। কিন্তু এগুলোকে তোমরা পশু ও জীব-জন্তুর দৃষ্টিতে দেখে থাকো। পশুরা এসব দেখে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা ও বোধশক্তি সম্পন্ন মস্তিষ্ক দিয়েছেন, তা তোমরা কাজে লাগাও না। আর এ কারণেই তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশেষে একদিন তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। নবীর কাজ এ নয় যে, তিনি তোমাদেরকে সেদিনটির আগমনের সময় ও তারিখ বলে দেবেন। তার কাজ তো শুধু এতটুকু যে, সেদিনটির আসার আগেই তিনি তোমাদের সাবধান করে দেবেন। আজ তোমরা তার কথা মানছো না। বরং ঐ দিনটি তোমাদের সামনে হাজির করে দেখিয়ে দেয়ার দাবী করছো। কিন্তু যখন তা এসে যাবে এবং তোমরা তা চোখের সামনে হাজির দেখতে পাবে তখন তোমরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

২৮ থেকে ২৯ নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের কিছু কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এসব কথা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিষাপ দিতো এবং তাঁর ও ঈমানদারদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য বদ দোয়া করতো। তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বানকারীরা ধ্বংস হয়ে যাক বা আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুক তাতে তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কি করে হবে? তোমরা নিজের জন্য চিন্তা করো। আল্লাহর আযাব যদি তোমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং যাঁরা তাঁর

ওপরে তাওয়াক্কুল করেছে তোমরা মনে করছো তারা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন প্রকৃত গোমরাহ কারা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অবশেষে মানুষের সমানে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে বলা হয়েছেঃ মরুভূমি ও পর্বতময় আরবভূমিতে যেখানে তোমাদের জীবন পুরোটাই পানির ওপর নির্ভরশীল, পানির এসব বরুণা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসব জায়গায় পানির উৎসগুলো যদি ভূগর্ভের আরো নীচে নেমে উধাও হয়ে যায় তাহলে আর কোন শক্তি আছে, যে এই সঞ্জীবনী -ধারা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

সূরার ফযিলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ কুরআনের ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা তাবারাকাল্লাযী (অর্থাৎ সূরা আল-মুলক) তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। এমনকি তাকে মাফ করে দেয়া হবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুপারিশকারী হবে। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক সূরা দু'টি না পড়ে ঘুমাতে না। [মিশকাত তাহকিক ছানী ২১৫৫, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২৮৯২]

আবুয যুবাইর (রহঃ) বলেন, এই সূরাহয় কুরআন মজীদে অন্যসব সূরার তুলনায় সত্তর গুণ সওয়াবের মর্যাদা লাভের অধিকারী। কোন ব্যক্তি এই সূরাহয় পড়লে তার জন্য এর বিনিময়ে সত্তরটি নেকী লেখা হয়, এর উসীলায় তার মর্যাদা সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং এর দ্বারা তার সত্তরটি গুনাহ মাফ করা হয়। (নাসাঈ, দারিমী, হাকিম, ইবনে আবু শায়বাহ)

আগের সূরা ও পরের সূরার সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরাতে রিসালাতের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে তাওহীদের কথা দলিল সহকারে পেশ করা হয়েছে এবং তাওহীদের দায়িত্বের ব্যাপারে ত্রুটি করলে তার পরিণতির কথাও পেশ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরাতে নেককার ও বদকার নারীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে এ আলোচনাকে সাধারণ ও ব্যাপক করে তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা মুলকে বেশীরভাগ আলোচনা ছিল তাওহীদের উপর এবং তার অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আর পরবর্তী সূরা কালামে অধিকাংশ আলোচনা রিসালাতের অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে। আর নবুয়তকে অবিশ্বাস করা কুফরি এবং এ কুফরির প্রতিফল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১. বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

শব্দটি থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হল বর্ধনশীল ও বেশী হওয়া। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর বহু উর্ধ্ব ও উচ্ছে। এর স্বীকা (আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) অনেক ও আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়। “সর্বময় কর্তৃত্ব বা রাজত্ব যাঁর হাতে” অর্থাৎ, সব রকমের শক্তি এবং আধিপত্য তাঁরই। তিনি যেভাবে চান বিশ্বজাহান পরিচালনা করেন। তাঁর কাজে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি ভিখারীকে বাদশাহ, আর বাদশাহকে ভিখারী, ধনীকে গরীব এবং গরীবকে ধনী বানান। তাঁর কৌশল ও ইচ্ছায় কারো হস্তক্ষেপ চলে না।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

তিনি পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাবাহিকতা চালু করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, কোন মানুষটির কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্য। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বেশ কিছু সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। প্রথম হলো, মৃত্যু এবং জীবন তাঁরই দেয়া। আর কেউ জীবনও দান করতে পারে না, মৃত্যুও না। দ্বিতীয় হলো, মানুষ একটি সৃষ্টি, তাকে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়, সৃষ্টা তাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। জীবন তার জন্য পরীক্ষার সময় বা অবকাশ মাত্র। মৃত্যুর অর্থ হলো, তার পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। তৃতীয় হলো, এ পরীক্ষার জন্য স্রষ্টা সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। সে ভাল মানুষ না খারাপ মানুষ, এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে সে যাতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। চতুর্থ হলো, কার কাজ ভাল এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাই তার ফায়সালা করবেন। কাজের ভাল -মন্দ বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়, বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীর কাজ। তাই যারাই পরীক্ষায় সফল হতে চাইবে, তাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষা গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে ভাল কাজ কি? পঞ্চম বিষয়টি পরীক্ষা কথাটির মধ্যেই নিহিত। তা হলো, যার কাজ যেমন হবে তাকে সে অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ ফলাফলই যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন অর্থ হয় না।

পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল এর দুটি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি হলো, তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং সবার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি জালেম ও কঠোর নন। দ্বিতীয়টি হলো, দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি দেয়ার পুরো ক্ষমতা তাঁর আছে। এতো শক্তি

কারো নেই যে তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যারা লজ্জিত হয়ে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে তিনি ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন।

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

৪. তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে।

মহান আল্লাহর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে এক রহস্যময় সৃষ্টির নাম আকাশ। সুনিপুণ আকাশের দিকে তাকালে, একটু চিন্তা করলে মনের গহিনে প্রশ্ন উঁকি দেয়, কে সেই কারিগর? যে এ খুঁটিহীন বিশাল আকাশকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন? আল্লাহ তাআলা সে বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন এভাবে— ‘আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ। আর সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ। বর্ষণ করেছি পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে প্রচুর পানি, যা দিয়ে উদগত করি শস্য, উদ্ভিদ এবং ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যানসমূহ। (সূরা নাবা: ১২-১৬)

আকাশের রহস্যের শেষ কোথায় তা আল্লাহই ভালো জানেন। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ সপ্তস্তর বা সাত আকাশের পুরুত্ব ও দূরত্ব নিয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের ধারণা, এ সপ্তাকাশের প্রথম স্তরের পুরুত্ব আনুমানিক ৬.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। দ্বিতীয় আকাশের ব্যাস ১৩০ হাজার আলোকবর্ষ, তৃতীয় স্তরের বিস্তার ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। চতুর্থ স্তরের ব্যাস ১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। পঞ্চম স্তরটি ১ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে, ষষ্ঠ স্তরটি অবস্থিত ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের আর সপ্তম স্তরটি বিস্তৃত হয়ে আছে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত।

কত সময় অযথা নষ্ট হয়, অথচ একটু সময় করে আল্লাহ তাআলার এ সুনিপুণ আকাশ নিয়ে ভাবে না বান্দা। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে?’ (সূরা আল গাশিয়াহ: ১৮)। ‘আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশের নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।’ (সূরা আশ্বিয়া: ৩২)।

জ্ঞানীদের উচিত আকাশের নান্দনিকতা, সুনিপুণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। যা মহান রবের পরিচয় জানতে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে, সর্বোপরি মহান রবের অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।” (সূরা আল ইমরান: ১৯০-১৯১)

শুধু রহস্য নয়, আকাশের অনন্য সৌন্দর্যেও মুগ্ধ হতে হয়। সেই সৌন্দর্যের বিমুগ্ধতায় প্রশান্ত হয় চিত্ত। আকাশের রূপ-রহস্য আর সৌন্দর্য অসীম। দিনে এক রকম, রাতে রূপ পালটিয়ে আরেক রকম সৌন্দর্য। এর পরতে পরতে যে রয়েছে কোনো এক মহান কারিগরের অসংখ্য নিদর্শন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তারা কি দেখে না তাদের মাথার উপরে আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে নির্মাণ করেছি এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি এবং তাতে নেই কোনো ফাটল’ (সূরা ক্বাফ: ৫০/৬)

আয়াত ৩ এবং ৪ এ ৭ টি আসমানে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টির নৈপুণ্য এর কথা বলা হয়েছে এবং কোন খুত/অসংগতি আছে কিনা তা খুজতে বলা হয়েছে। একবার নয় বরং আরো একবার (বারবার) খুজে দেখতে বলা হয়েছে। কারন ১ম বার মানুষ অবাক হয়ে কোন কিছু দেখে। তখন কোন ভুল ত্রুটি, অসঙ্গতি চোখে পড়ে না। ২য় বার বা বারবার ভাল করে দেখলে ভুল ধরা পড়ে। তাই ১ম অবাক দৃষ্টির পর ২য় অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়েও খুত/অসংগতি খুজতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আল্লাহ সারা জীবনের জন্য সকলের নিকট ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন যে, যতবারই দেখা হোক না কেন কোন অসঙ্গতি ধরা পড়বে না।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

৫. আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

কাছের আসমান অর্থ সে আসমান যার তারকারাজি এবং গ্রহসমূহকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। এর চেয়েও দূরে অবস্থিত যেসব বস্তুকে দেখতে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় তাহলো দূরের আসমান। আর যন্ত্রপাতির সাহায্যও যা দেখা যায় না তাহলো অধিক দূরবর্তী আসমান।

মাসাবিহা শব্দটি এখানে অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এসব প্রদীপের সুবিশাল হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কথাটির অর্থ হলো, আমি এ বিশ্ব-জাহানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জনমানবহীন করে সৃষ্টি করিনি। বরং তারকারাজির দ্বারা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি। রাতের অন্ধকারে মানুষ যার জাঁকজমক ও দীপ্তিময়তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়।

‘সেগুলোকে করেছি শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ’ এর অর্থ এটা নয় যে, এসব তারকা কেই শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। আবার এ অর্থও নয় যে, শুধু শয়তানদেরকে মারার জন্যই উল্কার পতন ঘটে। বরং এর অর্থ হলো তারকারাজি থেকে যে অসংখ্য উল্কাপিণ্ড নির্গত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এবং এরা অগণিত সংখ্যায় প্রতি মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে, সেগুলো পৃথিবীর শয়তানদের উর্ধ্ব জগতে উঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। তারা ওপরে উঠার চেষ্টা করলেও উল্কা পিণ্ডগুলো তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়টি বলার প্রয়োজন এ জন্য যে, গণকদের সম্পর্কে আরবের লোকেরা এ ধারণা পোষণ করতো যে, শয়তানরা তাদের অনুগত বা শয়তানদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। এসব শয়তানের মাধ্যমে তারা গায়েবের খবর পেয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে

মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারে। গণকরা নিজেরও এ দাবী করতো। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, শয়তানদের ঊর্ধ্ব জগতে ওঠা এবং সেখান থেকে গায়েবের খবর অবহিত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ উল্কাগুলো আসলে কি? এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ কোন সিদ্ধান্ত দিতে এখনো অক্ষম। তা সত্ত্বেও আধুনিককালে যেসব তত্ত্ব ও বাস্তব অবস্থা মানুষের জ্ঞানের আওতায় এসেছে এবং ভূপৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ডসমূহের পর্যবেক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তত্ত্বটি হলোঃ এসব উল্কাপিণ্ড কোন গ্রহে বিক্ষোভের কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াতে থাকে এবং কোন এক পর্যায়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে।

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

৬. আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; এবং তা কত মন্দ ফিরে যাওয়ার স্থান!

মানুষ হোক কিংবা শয়তান যারাই তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, এটাই হয়েছে তাদের পরিণাম।

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ

৭. যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত।

মূল ইবারতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, “জাহান্নামের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে।” [সূরা আল-ফুরকান: ১২] আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, এ জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে হাঁপাতে, গোঙ্গাতে এবং হাসফাস করতে থাকবে।” [সূরা হূদ; ১০৬]

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

এ প্রশ্নের ধরন আসলে প্রশ্নের মত হবে না এবং তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এসেছিল কিনা জাহান্নামের কর্মচারীরা তাদের কাছে তা জানতেও চাইবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হবে তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি

আদায় করা যে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি কোন বেইনসারফী করা হচ্ছে না। তাই তারা তাদের মুখ থেকেই এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করতে চেষ্টা করবেন যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে বেখবর রাখেননি। তিনি তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছিলেন, সত্য কি ও সঠিক পথ কোনটি তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ সত্য ও সঠিক পথের বিপরীত পথে চলার পরিণাম স্বরূপ যে তাদের এ জাহান্নামের জ্বালানি হতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আজ সে জাহান্নামেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু তারা নবীদের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে এখন যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তারা আসলে তার উপযুক্ত।

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একটি পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষাটি নেয়ার পদ্ধতি এমন নয় যে, মানুষকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে সঠিক পথে সে চলে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বরং তাকে সঠিক পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্য যে সম্ভাব্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল মহান আল্লাহ তা পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করেছেন। সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নবী-রাসূল পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। মানুষ আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে চলবে, না তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটবে, এখন তাদের সমস্ত পরীক্ষা এ একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবুওয়াত মহান আল্লাহর একটি প্রমাণ। এভাবে তিনি মানুষের সামনে তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা মানা বা না মানার ওপরে মানুষে ভবিষ্যত নির্ভর করছেন নবী-রাসূলদের আগমনের পর কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা না জানার ওজর পেশ করতে পারে না। তাকে না জানিয়ে অলক্ষ্যেই এতো বড় পরীক্ষা নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখন বিনা অপরাধেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এ ওজর তার ধোপে টিকবে না। এ বিষয়টি এতো অধিকবার বিভিন্নভাবে কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন।

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

৯. তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছ।

আমরা পয়গম্বরদেরকে সত্যজ্ঞান করার পরিবর্তে তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলাম। আসমানী কিতাবসমূহকে একেবারে অস্বীকার করেছিলাম। এমনকি আল্লাহর পয়গম্বরদেরকে আমরা বলেছিলাম যে, তোমরা বড়ই ভ্রষ্টতার মধ্যে আছ।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

১০. আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না।

আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। এখানে শোনার কাজকে বুঝার কাজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ হলো, প্রথমে নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত। চিন্তা-ভাবনা করে তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর্যায় আসে এর পরে। নবীর দিকনির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সরাসরি সঠিক পথ লাভ করা যায় না।

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ

১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য!

অপরাধ কথাটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে যে কারণে তারা জাহান্নামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো রসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করা। অন্যসব অপরাধ এরি ডাল-পালা মাত্র।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

১২. যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এটিই হলো নৈতিকতার মূল। কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে শুধু এ জন্য বিরত থাকে যে, তার নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিচারে কাজটি খারাপ কিংবা সব মানুষ সেটিকে খারাপ মনে করে কিংবা তা করলে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে কিংবা এজন্য কোন পার্থিব শক্তির তাকে পাকড়াও করার ভয় আছে তাহলে সেটি হবে নৈতিকতার একটি স্থায়ী ভিত্তি। মানুষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ভুলও হতে পারে। বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতার কারণে সে একটি ভাল জিনিসকে মন্দ এবং একটি মন্দ জিনিসকে ভাল মনে করতে পারে। ভাল ও মন্দ যাচাই করার পার্থিব মানদণ্ড প্রথমত এক রকম নয়। এ ছাড়াও তা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। দুনিয়ার নৈতিক দর্শনে কোন বিশ্বজনীন ও স্থায়ী মানদণ্ড বর্তমানেও নেই অতীতেও ছিল না। পার্থিব ক্ষতির আশংকাও নৈতিকতার কোন স্বতন্ত্র মানদণ্ড নয়। দুনিয়ার জীবনে নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে শুধু এ ভয়ে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই, এমন অবস্থায় সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে না। একইভাবে কোন পার্থিব শক্তির কাছে জবাবদিহির আশংকাও এমন কিছু নয় যা একজন মানুষের ভদ্র ও সং হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সবাই জানে, পার্থিব কোন শক্তিই দেখা ও না দেখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী নয়। তার দৃষ্টির বাইরে অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যেকোন পার্থিব শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য কৌশল ও ফন্দি-ফিকির অবলম্বন সম্ভব। এ ছাড়াও পার্থিব শক্তির রচিত আইন ব্যবস্থা সব রকমের অপরাধকে তার আওতাধীন করতে পারে না। বেশীর ভাগ অপরাধই এমন পর্যায়ে, পার্থিব আইন-কানুন যার ওপর আদৌ কোন হস্তক্ষেপ করে না। অথচ পার্থিব আইন ব্যবস্থা যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর চেয়ে তা জঘন্য।

তাই ইসলামী জীবন বিধান নৈতিকতার প্রসাদ এমন একটি বুনিয়াদের ওপর নির্মাণ করেছে যার ভিত্তিতে অদৃশ্য আল্লাহর ভয়ে সব খারাপ কাজ বর্জন করতে হয়। যে আল্লাহ সর্বাবস্থায় মানুষকে দেখছেন, যার হস্তক্ষেপ ও পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা কররে মানুষ কোথাও যেতে সক্ষম নয়। যিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি সার্বিক, বিশ্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড দিয়েছেন, শুধু তাঁর ভয়ে মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জন করা এবং ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করা এমন একটি কল্যাণকর নীতি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণটি ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে কোন মানুষ অন্যায় না করে কিংবা বাহ্যিকভাবে যেসব কাজে নেকীর কাজ বলে গণ্য হয় তা করে তাহলে তার এ নৈতিকতা আখেরাতে কোন মূল্য ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ তা হবে বালির স্তূপের ওপর নির্মিত প্রাসাদের মতো।

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

একথাটি কাফের ও মুমিন নির্বিশেষে গোটা মানব জাতিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। এতে মুমিনের জন্য শিক্ষা হলো, দুনিয়ায় জীবন যাপনকালে তাকে তার মন-মগজে এ অনুভূতি কার্যকর রাখতে হবে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা ও কাজই শুধু নয় তার নিয়ত ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। আর কাফেরের জন্য এতে সাবধানবাণী হলো এই যে, আল্লাহকে ভয় না করে সে নিজ অবস্থানে থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু তার কোন একটি ব্যাপারও আল্লাহর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আওতা বহির্ভূত নয়।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

মন ও অন্তর এবং তাতে উদিত যাবতীয় খেয়ালের সৃষ্টিকর্তা তো মহান আল্লাহই। তিনি কি নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবহিত থাকতে পারেন? এখানে প্রশ্নবাচক শব্দ অস্বীকৃতি সূচক। অর্থাৎ, তিনি অনবহিত নন; তিনি সব জানেন।

এর অর্থ হল সূক্ষ্মদর্শী। الْقُلُوبِ اَلَّذِي لَطَفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوبِ, যিনি হৃদয়ের যাবতীয় খবর ও অবস্থা সূক্ষ্মভাবে জানেন ও দেখেন।

ফুটনোট

- সূরাটিতে প্রথমে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এবং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে।
- এই সূরার প্রথমদিকের আয়াতগুলোতে আল্লাহর কিছু পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে-
 - সর্বময় কর্তৃত্ব তার হাতে;
 - তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান
 - তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন
 - তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
 - তিনি রাহমান
 - তিনি সুস্বদর্শী, সম্যক অবহিত।
- ২য় আয়াতের ‘যিনি মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন’ এই কথাটি হতে বোঝা যায় যে, মৃত্যু আলাদা একটি সৃষ্টি; শুধুমাত্র জীবনের অনুপস্থিতিই মৃত্যু নয়। এছাড়া আরো বোঝা যায় যে, যিনি মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তিনি অবশ্যই মৃত্যু থেকে মুক্ত, অর্থাৎ মৃত্যু তাঁর উপর কার্যকর হতে পারে না।
- ৭ টি আসমান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টির নৈপূণ্য এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- সৃষ্টির নৈপূণ্য দেখার কথা বলা হয়েছে।
- রাসূল সাঃ কে আমাদের জন্য সর্তককারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে।
- নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত।
- নবুয়তের অবিশ্বাসকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।
- সূরা মুলকের অনেক ফযিলত রয়েছে একটি হলো- যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুপারিশকারী হবে। আরেকটি ফজিলত হলো- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক সূরা দু’টি না পড়ে ঘুমাতে না।